প্রথম আলো

18 MAR 2012

তারিখ ... 18 MAR 2012 ...
পৃ ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় সাজা হয় না

শরিফুল হাসান ●

নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত রাখার ঘোষণা ছিল আওয়ামী লীগের। বাস্তবতা হলো, মহাজোট সরকারের গত তিন বছরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন ছাত্র।

সর্বশেষ গত শুক্রবার ছাত্রলীগের হামলায় মারা গেলেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ছাত্র আবদুল আজিজ খান। ক্যাম্পাস ও হলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, টেন্ডারবাজি নিয়ন্ত্রণের মতো ঘটনায় এসব প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এর একটি ঘটনারও বিচার হয়নি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ৪০ বছরে দেশের চারটি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন সব মিলিয়ে ১২৯ জন ছাত্র। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়জন ছাত্র মারা যান।

প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথা মেনে তদন্ত কমিটি করেছিল। থানাতেও মামলা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ডামাডোলে হারিয়ে গেছে এসব মামলা। তাই বিচারের অপেক্ষায় থাকা স্বজনদের আহাজারি কখনোই শেষ হয় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

● বিচার হয়নি ৫৪ ছাত্র হত্যার : পৃষ্ঠা-৯

৪০ বছরে চার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৯ খুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ এবং জাহাঙ্গীরনগরে ৬ খুন

বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় শাস্তি হয় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখিনি, একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিচার হয়েছে।' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক নাটাকার মলয় ভৌমিক বলেন, 'আমি আমার ৩৫-৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একটি হত্যাকাণ্ডেরও বিচার হয়নি। ঠিকমতো বিচার চাওয়াও হয়নি, বরং লাশের রাজনীতি হয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ঘটনা ঘটেছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবু বকর নিহত হন। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ওই ঘটনার বিচার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দিলেও বিচার পায়নি আবু বকরের পরিবার।

বকরের বাবা রুস্তম আলী (৭০) আক্ষেপ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যারা মারামারি করল, তারা ক্লাস করে, রাজনীতি করে। কিন্তু আমার সোনার ছেলে মইরা গেল, কোনো বিচার নাই। আমি একটা দিনমজুর। আমার জন্য ব্যারিস্টার, এমপি-মিনিস্টার নাই। আমি ক্যামনে তাদের সাথে পারমু?'

এর আগে ২০০৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল ছাত্রদলের নেতা মাহাবুবুল ইসলাম বোকন। ওই হত্যাকাণ্ডের পর দুটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও প্রতিবেদন জমা পড়েনি। শাহবাগ থানায় মামলা হলেও এর বিচারকাজ শেষ হয়নি। খুনিরা এখন ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের নেতা পার্থপ্রতিম আচার্যকে হত্যা করা হয়। ১৯৯৬ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জগন্নাথ হলে একজন মারা যান। ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই কার্জন হল এলাকায় খুন হন ছাত্রলীগের কর্মী তনাই। একই বছর শাহীন নামে এক ছাত্রের মৃতদেহ পাওয়া যায় কার্জন হলে। ১৯৯৭ সালে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বঙ্গবন্ধু হলে গুলি করে হত্যা করা হয় আরিফকে। প্রতিটি ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও প্রতিবেদন দেওয়া হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও সংরক্ষিত নেই। তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ৬৬টি হত্যাকাণ্ডের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল মুহসীন হলের 'সেভেন মার্ডার' বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানসহ অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা মুক্তি পান।

এ ছাড়া ১৯৭৭ সালে হানু ও গোপা, ১৯৮৩ সালে জয়নুল, ১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাউফুন বসুনিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ১৯৮৬ সালে ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মারা যান আসলাম। ১৯৮৭ সালের মার্চে মুহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন ছাত্রদলের নেতা বাবলু এবং তাঁর দুই সহযোগী মইনুদ্দীন ও নূর মোহাম্মদ। একই বছরের ১৪ জুলাই ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ছাত্রদলের কর্মী মালিম নিহত হন। এ ঘটনার পরের দিন এস এম হলে ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধে জাসদের মুরাদ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর মারা যান বজলুর রশিদ।

১৯৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংঘর্ষে মধুর ক্যানটিনের সামনে জাসদ ছাত্রলীগের কর্মী কফিল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ওই বছরের ২৯ ডিসেম্বর এস এম হলে ফিন্যান্সের ছাত্র আরিফকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

১৯৯০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সূর্য সেন হলে আলমগীর কবীর মারা যান। ওই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি জহুরুল হক হল ছাত্রলীগ ও মুহসীন হল শাখা ছাত্রদলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি চুন্নু। একই দিন ফজলুল হক হলে শাহীন নামে আরেক ছাত্রের লাশ উদ্ধার হয়। ঘটনাবহুল নব্বইয়ের ২৭ নভেম্বর ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ক্রসফায়ারে পড়ে নিহত হন ডা. মিলন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় সংঘর্ষে মারা যান আরও অন্তত ৩০ জন ছাত্র। কিন্তু একটি ঘটনারও বিচার হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একটি হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো তদন্ত করতে পারে, কিন্তু শাস্তি দিতে পারেন আদালত। তদন্ত করবে পুলিশ। কিন্তু রাষ্ট্র এই কাজগুলো শেষ পর্যন্ত করে না। এ কারণে কেউ শাস্তি পায় না। আমি মনে করি, শাস্তি পায় না বলেই পরবর্তী হত্যাকাণ্ড ঘটে। যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যেত, তাহলে এমন ঘটনা আর ঘটত না।'